ইউনিট
৩

জনসংখ্যা
(Population)

ভূমিকা

জনসংখ্যা বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বা অঞ্চলে বসবাসকারী এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত লোকজনকে বুঝানো হয়ে থাকে। যে কোনো ভৌগোলিক সীমানার জন্য জনসংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে স্থান এবং কালভেদে জনসংখ্যার আকার, ঘনত্ব ও বৃদ্ধিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেসব দেশ বা অঞ্চলে আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক, সেখানকার মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে অথবা বাধ্য হয়ে জনঘাটতিসম্পন্ন দেশ বা অঞ্চলে গমন করে। এ গমনের পিছনে বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। মানুষের এরূপ বাসস্থানের স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তনকে অভিগমন বলে। বর্তমান বিশ্বে মানুষ প্রতিনিয়ত খুব সহজেই একদেশ থেকে অন্যদেশ, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গমন করছে। যা জনসংখ্যার আকারগত পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে জনসংখ্যার যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা সন্তান জন্মের মাধ্যমে পূরণ হয়। অর্থাৎ জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক হলো জন্ম, মৃত্যু এবং অভিগমন। এই ইউনিটে বিশ্বের জনসংখ্যার আকার, ঘনত্ব ও বৃদ্ধি, জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক, জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল ও বাংলাদেশ, অভিগমন, বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বয়স-লিঙ্গ পিরামিড অঙ্কন এবং মানচিত্রে জনসংখ্যা বন্টন প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : জনসংখ্যা : আকার, ঘনত্ব ও বৃদ্ধি
পাঠ-৩.২ : জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক
পাঠ-৩.৩ : জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল ও বাংলাদেশ
পাঠ-৩.৪ : অভিগমন ও প্রকারভেদ
পাঠ-৩.৫ : অভিগমনের কারণ ও প্রভাব
পাঠ-৩.৬ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ
পাঠ-৩.৭: বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব
পাঠ-৩.৮ : বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায়

ব্যবহারিক

পাঠ-৩.৯ : বয়স-লিঙ্গ পিরামিড অঙ্কন ও বিশ্লেষণ
পাঠ-৩.১০ : মানচিত্রে জনসংখ্যার বণ্টন প্রদর্শন

পাঠ-৩.১ জনসংখ্যা: আকার, ঘনত্ব ও বৃদ্ধি (Population: Size, Density and Growth)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- জনসংখ্যার আকার, ঘনত্ব ও বৃদ্ধি বর্ণনা করতে পারবেন।

জনসংখ্যা

জনসংখ্যা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Population। সাধারণ অর্থে জনসংখ্যা বলতে কোনো দেশ বা অঞ্চলে কতজন লোক বাস করে তার সংখ্যাকে বুঝায়। তবে ভৌগোলিক অর্থে জনসংখ্যা বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা অঞ্চলে বসবাসকারী এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত লোকজনকে বুঝানো হয়ে থাকে। এটি এমন একটি উপাদান যা কোনো ভৌগোলিক সীমানা জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক।

জনসংখ্যার আকার (Size of Population) : জনসংখ্যার আকার বলতে কোনো জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত মানুষের মোট সংখ্যাকে বুঝানো হয়ে থাকে। কোনো জনসংখ্যার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এর আকারগত বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃশ্যমান হয়। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের জনসংখ্যার আকারগত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেগুলোর মধ্যে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। যেমন-১৯৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২,৫১৯ মিলিয়ন বা ২৫১.৯ কোটি যা বেড়ে ১৯৯৯ সালের ১২ অক্টোবর দাঁড়ায় ৬,০০০ মিলিয়ন বা ৬০০ কোটি বা ৬ বিলিয়নে। এই দিনটিকে সারা বিশ্বে Six Billion Day হিসেবে পালন করা হয়। সারণি ৩.১.১ এ সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের জনসংখ্যার আকার দেখানো হয়েছে। আবার মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যার আকার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এশিয়া মহাদেশে সবচেয়ে বেশি এবং অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে সবচেয়ে কম লোক বাস করছে (সারণি ৩.১.২)।

সারণি ৩.১.১: সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের জনসংখ্যা

সাল	বিশ্বের জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
১৯৫০	২,৫১৯
১৯৬০	২,৯৮২
১৯৭০	৩,৬৯২
১৯৮০	৪,৪৩৫
১৯৯০	৫,২৬৩
২০০০	৬,০৭০
২০১৬	৭,৪১৮

উৎস: ইউএন সেনসাস ব্যুরো-২০১০ এবং পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো (পিআরবি)২০১৬

সারণি ৩.১.২: মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যার আকার

মহাদেশ	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
এশিয়া	৪,৪৩৭
আফ্রিকা	১,২০৩
ইউরোপ	৭৪০
দক্ষিণ আমেরিকা	৪১৯
উত্তর আমেরিকা	৩৬০
অস্ট্রেলিয়া	৪০

উৎস: পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো (পিআরবি)-২০১৬

একইভাবে আমরা যদি দেশভিত্তিক জনসংখ্যার আকার দেখি তাহলে এক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ সকল দেশের জনসংখ্যার আকার সমান নয়। কোনো দেশ জনবহুল আবার কোনো দেশ জনবিরল। দেশভিত্তিক জনসংখ্যার আকার সারণি ৩.১.৩ এ দেখানো হয়েছে। সারণিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা চীনে এবং তারপরই ভারতের অবস্থান। আবার সবচেয়ে কম জনসংখ্যা বাস করছে মোনাকোতে। জনসংখ্যার আকারগত এই ভিন্নতার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যা জনমিতিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে জনসংখ্যার মোট বৃদ্ধির পরিমাণকে প্রভাবিত করে।

সারণি ৩.১.৩: দেশভিত্তিক জনসংখ্যার আকার

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
চীন	১৩৭৮.০	পাকিস্তান	২০৩.৪	যুক্তরাজ্য	৬৫.৬	অস্ট্রেলিয়া	২৪.১
ভারত	১৩২৮.৯	নাইজেরিয়া	১৮৬.৫	দক্ষিণ আফ্রিকা	৫৫.৭	শ্রীলঙ্কা	২০.২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩২৩.৯	বাংলাদেশ	১৬১.৭	আর্জেন্টিনা	৪৩.৬	সিঙ্গাপুর	৫.৬
ইন্দোনেশিয়া	২৫৯.৪	রাশিয়া	১৪৪.৩	সৌদি আরব	৩১.৭	মালদ্বীপ	০.৪
ব্রাজিল	২০৬.১	মিশর	৯৩.৫	নেপাল	২৮.৪	মোনাকো	০.০৪

উৎস: পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো (পিআরবি)-২০১৬ এবং বিবিএস-২০১৭

জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population) : সাধারণভাবে ঘনত্ব বলতে কোনো বস্তুর উপাদানগত সংবদ্ধতা বা দৃঢ়তাকে বুঝানো হয়ে থাকে। তবে জনসংখ্যার ঘনত্ব হলো কোনো নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলে সংঘবদ্ধ অবস্থানের নিবিড়তা। জনসংখ্যা বণ্টনের পার্থক্য জানার জন্য জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্গমাইল বা বর্গকিলোমিটারে প্রকাশ করা হয়। কোনো অঞ্চল বা দেশের আয়তনকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট আয়তন}}$$

উদাহরণ হিসেবে উপরের সূত্রানুযায়ী আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করতে পারি। ধরি, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬,১৭,০০,০০০ জন এবং আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

$$\text{সুতরাং জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{১৬,১৭,০০,০০০}{১,৪৭,৫৭০} = ১,০৯৬ \text{ জন (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)}$$

বিশ্বে সর্বত্র জনসংখ্যার ঘনত্ব এক রকম নয়। স্থানিক পার্থক্যের কারণে জনসংখ্যার ঘনত্বেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোনো অঞ্চল বা দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের নিবিড়তা নির্ভর করে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ নানাবিধ নিয়ামকের উপর। আমরা যদি মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, এশিয়া মহাদেশে যেমন সর্বাধিক লোক বাস করে ঠিক তেমনি জনসংখ্যার ঘনত্বও সর্বাধিক। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯১৯ জন বাস করছে। অপরদিকে, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করছে মাত্র ৮৫ জন (সারণি ৩.১.৪)। আবার যদি দেশভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখি তাতেও ভিন্নতা দেখা যায়। সারণি ৩.১.৫ এ কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখানো হলো।

সারণি ৩.১.৪ : মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব

মহাদেশ	জনসংখ্যার ঘনত্ব
এশিয়া	৯১৯
আফ্রিকা	৫১৪
দক্ষিণ আমেরিকা	৩০২
ইউরোপ	২৬৬
উত্তর আমেরিকা	১৮২
অস্ট্রেলিয়া	৮৫

উৎস: পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো (পিআরবি)-২০১৬

সারণি ৩.১.৫: দেশভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব (২০১৫)

দেশের নাম	ঘনত্ব (ব.কি.মি)	দেশের নাম	ঘনত্ব (ব.কি.মি)	দেশের নাম	ঘনত্ব (ব.কি.মি)
মোনাকো	১৮,৮৬৬	পাকিস্তান	২৪৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৫
সিঙ্গাপুর	৭,৮২৯	নাইজেরিয়া	২০০	ব্রাজিল	২৫
মালদ্বীপ	১,৩৬৪	নেপাল	১৯৯	আর্জেন্টিনা	১৬
বাংলাদেশ	১০৯৬	চীন	১৪৬	সৌদি আরব	১৫
ভারত	৪৪১	ইন্দোনেশিয়া	১৪২	রাশিয়া	৯
শ্রীলঙ্কা	৩৩৪	মিশর	৯২	অস্ট্রেলিয়া	৩
যুক্তরাজ্য	২৬৯	দক্ষিণ আফ্রিকা	৪৫		

উৎস: বিশ্বব্যাংক-২০১৬ এবং বিবিএস-২০১৭

সারণি ৩.১.৫ এ উল্লিখিত দেশসমূহের জনসংখ্যার ঘনত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্বে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। অধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে মোনাকো, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ অন্যতম। এরপরই রয়েছে বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্যের অবস্থান। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে পৃথিবীকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–

১. নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল;
২. পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল
৩. বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল এবং
৪. প্রায় জনহীন অঞ্চল।

১. নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল (Intensive Populated Region) : পৃথিবীর যে সকল দেশ বা অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০ জনের অধিক লোক বাস করে সেসব অঞ্চলকে নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল বলে। মোনাকো, সিঙ্গাপুর, মালদ্বীপ, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, চীন, জাপান, বাহরাইন, মাল্টা, বারমুডা, জার্মানি প্রভৃতি দেশ নিবিড় জনসংখ্যা অধ্যুষিত।

২. পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল (Moderate Populated Region) : পৃথিবীর যে সকল দেশ বা অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৫০-১০০ জন লোক বাস করে সেসব অঞ্চলকে পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল বলে। যেমন-মিশর, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক কেনিয়া, মেক্সিকো, ইরাক, ইরান প্রভৃতি।

৩. বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল (Sparesely Populated Region) : কোনো দেশ বা অঞ্চলে যদি প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২-৫০ জন লোক বাস করে তবে তাকে বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল বলে। যেমন- দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আইসল্যান্ড, সৌদি আরব, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকার প্রেইরি, দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস, ইউরেশিয়ার স্টেপস্।

৪. প্রায় জনহীন অঞ্চল (Nearly Uninhabited Region) : প্রায় জনহীন অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় একজনের কম লোক বাস করে। এসব এলাকা অত্যন্ত দুর্গম এবং মানুষ বসবাসের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। সাহারা ও কালাহারি মরুভূমি, আমাজান উপত্যকা, হিমালয়, রকি ও আন্দিজ পর্বতমালা এ ধরনের অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Growth of Population)

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। এই বৃদ্ধির ধারা কখনো ধীর আবার কখনো বা দ্রুতগতিতে ঘটছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই ধারা সকল দেশে সমান নয়। সময় এবং স্থানভেদে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধীরগতির হয়ে থাকে। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ২০১৫ সালের মধ্য পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব, উন্নত এবং অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সারণি ৩.১.৬ এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.১.৬ : সমগ্র বিশ্ব, উন্নত দেশ এবং অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

অংশ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার		
	১৯৬০-৬৫	১৯৮০-৮৫	২০১৬
সমগ্র বিশ্ব	১.৯৯	১.৭০	১.২
উন্নত দেশ	১.১৯	০.৬৮	০১
অনুন্নত দেশ	২.৩৩	২.০৮	২.২

সূত্র : United Nations estimates and projections as assessed in 1980-1990 and Population References Bureaus- 2016

মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সারণি ৩.১.৭ উল্লিখিত মহাদেশসমূহের মধ্যে আফ্রিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি এবং ইউরোপ মহাদেশে সবচেয়ে কম। আবার আমরা যদি দেশভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখি তাতেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সারণি ৩.১.৮ উল্লিখিত দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি নাইজেরিয়া এবং সবচেয়ে কম মোনাকো। রাশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য।

সারণি ৩.১.৭: মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

মহাদেশ	বৃদ্ধির হার (%)
আফ্রিকা	২.৬
এশিয়া	১.১
অস্ট্রেলিয়া	১.০
দক্ষিণ আমেরিকা	১.০
উত্তর আমেরিকা	০.৪
ইউরোপ	০.০

উৎস: পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো (পিআরবি)-২০১৬

সারণি ৩.১.৮: দেশভিত্তিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

দেশের নাম	বৃদ্ধির হার (%)	দেশের নাম	বৃদ্ধির হার (%)
নাইজেরিয়া	২.৬	শ্রীলঙ্কা	১.০
মিশর	২.৫	আর্জেন্টিনা	১.০
পাকিস্তান	২.৩	ব্রাজিল	০.৮
সৌদি আরব	১.৮	চীন	০.৫
মালদ্বীপ	১.৬	অস্ট্রেলিয়া	০.৫
ভারত	১.৫	সিঙ্গাপুর	০.৪
নেপাল	১.৫	যুক্তরাজ্য	০.৩
বাংলাদেশ	১.৩৭	মোনাকো	০.১
ইন্দোনেশিয়া	১.৩	রাশিয়া	০.০
দক্ষিণ আফ্রিকা	১.২		

উৎস: পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো (পিআরবি)-২০১৬ এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭

শিক্ষার্থীর কাজ	ধরুন, ভারতের জনসংখ্যা ১,৩২,৯০,০০,০০০ জন এবং আয়তন ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

সাধারণ অর্থে জনসংখ্যা বলতে কোনো দেশ বা অঞ্চলে কতজন লোক বাস করে তার সংখ্যাকে বুঝায়। যে কোনো ভৌগোলিক সীমানার জন্য জনসংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে জনসংখ্যার আকারগত বৈশিষ্ট্য বিশ্বের সর্বত্র সমান নয়। যেমন-মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যার দিক থেকে এশিয়া বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অস্ট্রেলিয়া। দেশভিত্তিক জনসংখ্যার আকারও একই রকম নয়। যেমন- চীন ও ভারতে জনসংখ্যা সর্বাধিক। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে অষ্টম। আবার একইভাবে বিশ্বের সর্বত্র জনসংখ্যার ঘনত্বও একইরকম নয়। কোথাও রয়েছে নিবিড়, পরিমিত, বিরল বা প্রায় জনহীন অঞ্চল। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেও তারতম্য বিদ্যমান। সুতরাং বলা যায় যে, জনসংখ্যা পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া যেখানে স্থান এবং কালভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন মহাদেশে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি?

(ক) এশিয়া (খ) ইউরোপ (গ) আফ্রিকা (ঘ) উত্তর আমেরিকা

২। বিশ্বের জনসংখ্যা 'Six Billion Day' পালন করা হয় কবে?

(ক) ১২ অক্টোবর, ১৯৯৭ (খ) ১২ অক্টোবর, ১৯৯৮ (গ) ১২ অক্টোবর, ১৯৯৯ (ঘ) ১২ অক্টোবর, ২০০০

৩। একটি এলাকার আয়তন ২০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১০,০০০ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কত?

(ক) ৫০ জন (খ) ২৫০ জন (গ) ৫০০জন (ঘ) ৭৫০ জন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ থেকে ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বিশ্বের সর্বত্র জনসংখ্যার বন্টন এবং ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। জনসংখ্যার স্থানিক ভিন্নতার বহুবিধ কারণ রয়েছে। জনসংখ্যার এই পরিবর্তন একটি চলমান প্রক্রিয়া।

৪। বিশ্বের কোন দেশে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি?

(ক) ভারত (খ) চীন (গ) বাংলাদেশ (ঘ) নিউজিল্যান্ড

৫। জনসংখ্যা বণ্টনের পার্থক্য জানার জন্য কী নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়?

(ক) ঘনত্ব (খ) বৃদ্ধির হার (গ) জন্মহার (ঘ) মৃত্যুহার

৬। পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত-

i. সুইজারল্যান্ড ii. মোনাকো iii. মিশর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক (Factors of Population Change)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা পরিবর্তন বলতে কী বুঝায় তা জানবেন;
- জনসংখ্যার পরিবর্তন পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামকসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

জনসংখ্যা পরিবর্তন

জনসংখ্যা পরিবর্তন বলতে সময়ে সময়ে কোনো জনসংখ্যার যে সংখ্যাত্মক পরিবর্তন হয় তাকে বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ জনসংখ্যা সর্বদা পরিবর্তনশীল। জনসংখ্যার এই পরিবর্তন ধনাত্মক বা ঋনাত্মক যে কোনোটিই হতে পারে। তবে সাধারণত জনসংখ্যার ধনাত্মক পরিবর্তনই দেখা যায়। কদাচিৎ ক্ষেত্রে কোনো দেশ বা অঞ্চলে জনসংখ্যার ঋনাত্মক পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। জনসংখ্যা পরিবর্তন পর্যালোচনার মাধ্যমে কোনো দেশ বা অঞ্চলের লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ তথা জনমিতিক ভারসাম্য নিরীক্ষণ করা যায়।

যে কোনো দেশ বা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতির জন্য জনসংখ্যার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য জানা জরুরি। এসব কারণে কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যা জানার জন্য তা গণনা করতে হয়। জনসংখ্যার এরূপ গণনাকে আদমশুমারী (Population Census) বলে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ৫ থেকে ১০ বছর ব্যবধানে জাতীয়ভাবে জনসংখ্যা গণনা করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। আমাদের দেশেও প্রতি ১০ বছর পরপর জনসংখ্যা গণনা বা আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বে আধুনিক আদমশুমারী চালু হয় সপ্তদশ শতকে। দুইটি শুমারীর ফলাফল তুলনা করলে জনসংখ্যা পরিবর্তন সহজেই বুঝা যায়। জনসংখ্যা পরিবর্তনের তারতম্যমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যা পরিবর্তনের গতিধারা জানা যায় এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা সহজ হয়। ২০১৬ সালের মধ্য পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যা পরিবর্তনের ধরণ সারণি ৩.২.১ এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.২.১: সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের জনসংখ্যা পরিবর্তন

সাল	জনসংখ্যা (কোটি)
১৯৫০	২৫১.৯
১৯৬০	২৯৮.২
১৯৭০	৩৬৯.২
১৯৮০	৪৪৩.৫
১৯৯০	৫২৬.৩
২০০০	৬০৭.০
২০১০	৬৮৯.২
২০১৬	৭৪১.৮

উৎস: ইউএন সেনসাস ব্যুরো-২০১০ এবং পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো (পিআরবি)-২০১৬

জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক (Factors of Population Changes)

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীলতার ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ামক মুখ্য ভূমিকা পালন করে। নিম্নে এসব নিয়ামকসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. জন্মহার (Birth Rate) : কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলে এবং নির্দিষ্ট একটি বছরে প্রতি হাজার নারীর সন্তান জন্মদানের মোট সংখ্যাকে জন্মহার বলে। মানুষের মরণশীলতার কারণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সন্তান জন্মের মাধ্যমে তা পূরণ হয়। সাধারণত ১৫ বছর থেকে শুরু করে ৪৫ বা ৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের প্রজনন ক্ষমতা থাকে। প্রজননশীলতা পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো স্থুল জন্মহার বা Crude Birth Rate (CBR)। এ পদ্ধতিতে কোনো বছরে জন্মলাভকারী সন্তানের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করা হয়। স্থুল জন্মহার নির্ণয়ের জন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে জন্মলাভকারী সন্তান সংখ্যা জানা আবশ্যক। স্থুল জন্মহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্ত সূত্রানুযায়ী-

$$\text{স্থুল জন্মহার} = \frac{\text{কোনো বছরে জন্মলাভ করা সন্তানের মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

সাধারণ জন্মহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

$$\text{সাধারণ জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মলাভকারী সন্তান}}{\text{নির্দিষ্ট বছরে প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা}} \times ১০০০$$

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুলো ছাড়াও জন্মহার নির্ণয়ের জন্য বয়স, নির্দিষ্ট জন্মহার, শিশুমাতা অনুপাত, মোট জন্মহার, স্থুল প্রজনন হার, নীট প্রজনন হার প্রভৃতি পদ্ধতি রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর সকল দেশের জন্মহার সমান নয়। সাধারণত উন্নত দেশগুলোতে জন্মহার কম এবং উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে জন্মহার তুলনামূলক বেশি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশকে এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়। বিশ্বের কয়েকটি দেশের জন্মহার সারণি ৩.২.২ এ দেখানো হয়েছে।

মৃত্যুহার (Death Rate) : কোনো একটি দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যার মধ্যে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বয়সের যত লোক মারা যায় তাকে মৃত্যুহার বলে। মানুষ মাত্রই মরণশীল হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। জন্মহারের তুলনায় মৃত্যুহার কম হলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মৃত্যুহার পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো স্থুল মৃত্যুহার বা Crude Death Rate (CDR)। নির্দিষ্ট কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারীদের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে স্থুল মৃত্যুহার পাওয়া যায়। স্থুল মৃত্যুহার নির্ণয়ের জন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে মৃত্যুর সংখ্যা জানা থাকা প্রয়োজন। স্থুল মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

$$\text{স্থুল মৃত্যুহার} = \frac{\text{কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারী মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

বিশ্বের সকল দেশ বা অঞ্চলে মৃত্যুহার এক রকম নয়। ফলে জনসংখ্যা পরিবর্তন ধারায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উন্নত দেশগুলোতে চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিক হওয়ার কারণে মৃত্যুহার অনেক কম। তবে উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোতে বিভিন্ন কারণে মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে অনুন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, খাদ্যাভাব, অসচেতনতা, কুসংস্কার প্রভৃতি। ২০১৬ সালের মধ্য পর্যন্ত কয়েকটি দেশের মৃত্যুহার সারণি ৩.২.২ এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.২.২ : বিশ্বের কয়েকটি দেশের জন্ম ও মৃত্যুহার

দেশ	জন্মহার (%)	মৃত্যুহার (%)	দেশ	জন্মহার (%)	মৃত্যুহার (%)
চীন	১.২	০.৭	রাশিয়া	১.৩	১.৩
ভারত	২.২	০.৭	সৌদি আরব	২.২	০.৪
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১.২	০.৮	মালদ্বীপ	১.৮	০.৩
ব্রাজিল	১.৪	০.৬	সিঙ্গাপুর	০.৮	০.৪
পাকিস্তান	৩.০	০.৭	সুরিনাম	১.৮	০.৭
নাইজেরিয়া	৩.৯	১.৩	আইসল্যান্ড	১.২	০.৭
বাংলাদেশ	১.৯	০.৫	আফগানিস্তান	৩.৭	০.৮
দক্ষিণ আফ্রিকা	২.২	১.০	অস্ট্রেলিয়া	১.৩	০.৭

উৎস: পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো (পিআরবি)-২০১৬

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যুহার পূর্বের তুলনায় উভয়টি কমেছে। এক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, জনসচেতনতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সারণি ৩.২.৩ এ বাংলাদেশের জন্ম ও মৃত্যুহারের চিত্র তুলে ধরা হলো–

সারণি ৩.২.৩: বাংলাদেশের জন্ম ও মৃত্যুহার

সাল	স্থুল জন্মহার (প্রতি হাজারে)			স্থুল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)		
	জাতীয়	শহর	গ্রাম	জাতীয়	শহর	গ্রাম
১৯৯৬	২৫.৬	১৯.০	২৭.৮	৮.২	৬.৫	৮.৮
২০০১	১৮.৯	১৩.৬	২০.৭	৪.৮	৪.৩	৫.২
২০০৬	২০.৬	১৭.৫	২১.৭	৫.৬	৪.৪	৬.০
২০১১	১৯.২	২০.২	১৭.৪	৫.৫	৪.৮	৫.৮
২০১৪	১৮.৯	১৭.২	১৯.৪	৫.২	৪.১	৫.৬

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০১৩ (পৃ. ১৩২) এবং ২০১৫ (পৃ. ৯২)

৩। **অভিগমন (Migration) :** স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য উৎসস্থল থেকে গন্তব্যস্থলে যাওয়াকে অভিগমন বলে। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় জনসংখ্যা পরিবর্তনে অভিগমনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো দেশ বা অঞ্চল থেকে ব্যাপকহারে লোক গমন বা আগমন করলে জনসংখ্যা পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে যখন একই দেশের অভ্যন্তরে অভিগমন করে তখন দেশের অভ্যন্তরে জনসংখ্যা পরিবর্তন হয়। আবার যখন একদেশ থেকে অন্যদেশে গমন করে তখন আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে জনসংখ্যা পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ বহির্গমনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা হ্রাস পায় এবং বহিরাগমণের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে উন্নত দেশসমূহে অভিগমনের প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় অভিগমন অত্যন্ত সহজ হয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে, জনসংখ্যার পরিবর্তন নির্ভর করে জন্ম ও অভিগমনের ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং মৃত্যু ও অভিগমনের ফলে জনসংখ্যার হ্রাসমূলক দুই বিপরীত অবস্থার পার্থক্যের উপর। উভয় অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য থাকলে জনসংখ্যা স্থিতিশীল থাকে অর্থাৎ এক্ষেত্রে জনসংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে, জন্ম ও অভিগমনের তুলনায় মৃত্যুহার কম হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক হচ্ছে জন্মহার, মৃত্যুহার এবং অভিগমনের হার। এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ প্রভৃতি জনসংখ্যা পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্থুল জন্ম ও স্থুল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র দুইটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

জনসংখ্যার পরিবর্তন বলতে কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যার আকারগত পরিবর্তনকে বুঝানো হয়ে থাকে। এই পরিবর্তন পর্যালোচনার মাধ্যমে জনমিতিক ভারসাম্য নিরীক্ষণ করা যায়। এতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সহজ হয়। জনসংখ্যা পরিবর্তনের মুখ্য নিয়ামক হলো জন্ম, মৃত্যু এবং অভিগমন। জন্ম ও মৃত্যুহার পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হলো যথাক্রমে স্থুল জন্ম এবং স্থুল মৃত্যুহার। জনসংখ্যার পরিবর্তন নির্ভর করে জন্ম ও অভিগমনের ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং মৃত্যু ও অভিগমনের ফলে জনসংখ্যার হ্রাসমূলক সংখ্যাত্মক পার্থক্যের উপর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জনসংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে-

i. ধণাত্মক ii. ঋণাত্মক iii. গুণিতক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। স্থুল জন্মহার নির্ণয় করা হয় কীভাবে?

(ক) প্রতি ১০০ জনে (খ) প্রতি ১০০০ জনে (গ) প্রতি ১০০০০ জনে (ঙ) প্রতি ১০০০০০ জনে

৩। জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক হলো-

i. জন্ম ii. মৃত্যু iii. অভিগমন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। ১৯৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা কত ছিল?

(ক) ২৩১.৯ কোটি (খ) ২৪১.৯ কোটি (গ) ২৫১.৯ কোটি (ঙ) ২৬১.৯ কোটি

পাঠ-৩.৩ জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল ও বাংলাদেশ (Demographic Transition Model and Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল কী তা বলতে পারবেন;
- মডেলের বিভিন্ন পর্যায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের আলোকে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল

জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল বা জনসংখ্যা পরিবৃত্ত মডেলটি জনসংখ্যা পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত। এটি এমন একটি মডেল যা সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যার পরিবর্তন বর্ণনা করে। আমরা পাঠ ৩.২ এ জেনেছি, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোনো দেশ বা অঞ্চলে জন্ম ও মৃত্যুহার পরিবর্তিত হলে ঐ দেশ বা অঞ্চলে জনসংখ্যা হয় বৃদ্ধি পায়, না হয় হ্রাস পায় নতুবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থির থাকে। জনসংখ্যার এরূপ পরিবর্তনের ফলে ট্রানজিশন মডেলের একধাপ থেকে অন্যধাপে পরিবর্তিত হয়। জনসংখ্যার এরূপ একধাপ থেকে অন্যধাপে পরিবর্তিত হওয়াই জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল নামে পরিচিত।

উৎপত্তি : ১৯২৯ সালে মার্কিন ভূগোলবিদ ওয়ারেন থম্পসন জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলটি উপস্থাপন করেন।

মূল বিষয়বস্তু : সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারায় যে পরিবর্তন হয় তাই এ মডেলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ওয়ারেন এই মডেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় জন্ম ও মৃত্যুহারের পরিবর্তন ধারার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

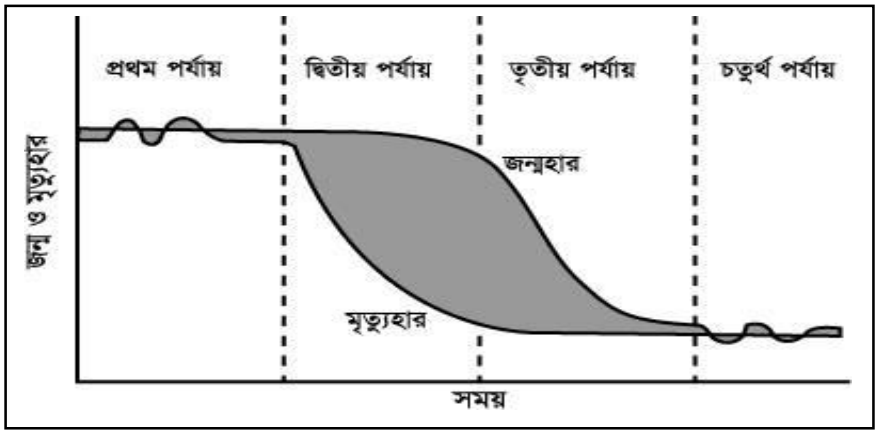

চিত্র ৩.৩.১ : জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল

জনমিতিক ট্রানজিশন তত্ত্বের পর্যায়সমূহ

জনসংখ্যার অবস্থানগত পরিবর্তন, বিশেষ করে জন্ম ও মৃত্যুহারের পরিবর্তন ধারার উপর ভিত্তি করে এ মডেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের পর্যায়সমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

প্রথম পর্যায় : প্রাথমিক পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি থাকে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম থাকে। এ পর্যায়ে কোনো আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকে না এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেরও কোনো প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে এ পর্যায়ভুক্ত দেশের সংখ্যা খুব কম। পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার কিছু দেশে এ অবস্থা দেখা যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় : দ্বিতীয় পর্যায়ে জন্মহার উচ্চ থাকে, তবে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। ফলে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এই ধাপকে শিল্প ধাপও বলা হয়ে থাকে। ইউরোপের শিল্প

বিপ্লবের পর এ ধাপের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় বলে একে শিল্প ধাপ বলা হয়। যা শুরু হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ এ পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ এ পর্যায়ের শেষ পর্যায়ে বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হলো নগরায়ন, কৃষির উন্নয়ন, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা প্রভৃতি।

তৃতীয় পর্যায় : তৃতীয় পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই নিম্নমুখী হয়। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথেষ্ট কমে আসে এবং জনসংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ের মতো প্রায় স্থিতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ পর্যায়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই নিম্নমুখী হয়। বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশ এ পর্যায়ভুক্ত।

চতুর্থ পর্যায় : জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের চতুর্থ পর্যায়টি হলো শেষ পর্যায়। এ পর্যায়টিকে আধুনিক পর্যায়ও বলা হয়। এ পর্যায়ে মৃত্যুর ফলে জনসংখ্যার যে হ্রাস ঘটে, জন্মের ফলে যে তা পূরণ নাও হতে পারে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই নিম্নমুখী। ফলে জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল থাকে। বর্তমানে ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ এ পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়।

জনমিতিক ট্রানজশিন মডেলের মূল্যায়ন : ওয়ারেন থম্পসন এর মডেলটিকে নিয়ে ১৯৪৫ সালে ফ্রাঙ্ক নটেস্টেন (Frank Notestein) এবং ১৯৪৭ সালে সি.পি.বি. ল্যাকার (C.P.B. Lacker) আলোচনা-সমালোচনা করেন। ১৯৯৬ সালে বিজু গার্ণিয়ার (Biju Garnier) জনমিতিক ট্রানজশিন মডেলের প্রথম পর্যায়কে প্রাচীন প্রকৃতির বৃদ্ধির পর্যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় দুটি একত্রে বিবর্তনকালীন বৃদ্ধি পর্যায় এবং চতুর্থ পর্যায়কে পরিণত হ্রাস পর্যায় বলে অভিহিত করেন। তবে বোগ (Bogue) পর্যায়গুলোকে তিনটি ভিন্ন নামে অভিহিত করেন। এগুলো হলো– বিবর্তন পূর্ব পর্যায়, বিবর্তনকালীন পর্যায় এবং বিবর্তন উত্তর পর্যায়।

জনমিতিক ট্রানজিশন মডেল এবং বাংলাদেশ

জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে এদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই উন্নয়নের সাথে জনসংখ্যার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের আলোকে বিবেচনা করলে বাংলাদেশ জনসংখ্যা উত্তরণের কোন পর্যায়ে রয়েছে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। সারণি ৩.৩.১ এ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও এর বৃদ্ধির হার দেখানো হলো।

সারণি ৩.৩.১ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা এবং হার

সাল	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)
১৯১১	৩১.৬	০.৮৭
১৯২১	৩৩.২	০.৬০
১৯৩১	৩৫.৬	০.৭৪
১৯৪১	৪২.০	১.৭০
১৯৫১	৪৪.২	০.৫০
১৯৬১	৫৫.২	২.২৬
১৯৭৪	৭৬.৪	২.৪৮
১৯৮১	৮৯.৯	২.৩৫
১৯৯১	১১১.৫	২.১৭
২০০১	১৩০.৫	১.৪৮
২০১১	১৪৪.১	১.৪৭
২০১৬	১৬১.৭	১.৩৭

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০১৫ এবং বিবিএস-২০১৭

সারণি ৩.৩.১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯১১ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থান ছিল প্রথম পর্যায়ের। এ সময় জন্ম ও মৃত্যুহার উচ্চ ছিল বলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ছিল। ১৯৫১ সালের পর থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি থাকায় মোট জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪.২ মিলিয়ন যা ১৯৯১ সালে দ্বিগুণের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে ১১১.৫ মিলিয়ন। বিশ শতকের ৬০ থেকে ৯০ এর দশকে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে। এসময় মৃত্যুহার হ্রাস পেতে থাকলেও সে তুলনায়

জন্মহার হ্রাস পায়নি। ফলে এ সময়ে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার ১৯৯১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে যা ২০১১ সালে ১.৪৭% এ দাঁড়ায়। এ সময় জন্ম ও মৃত্যুহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশ জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ প্রান্তে এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। কারণ বাংলাদেশ দ্রুত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করছে। শিল্পক্ষেত্রেও অগ্রগতি লাভ করছে এবং নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশ চিকিৎসা ক্ষেত্রেও অনেক দূর এগিয়েছে এবং মৃত্যুহার কমেছে। মানুষের মধ্যে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা শুরু হয়েছে এবং গড় আয়ু বেড়েছে। এতে জন্ম ও মৃত্যুহার নিম্নমুখী হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ দ্রুতই জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলের চিত্রটি অনুশীলন করুন।

সারসংক্ষেপ

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জনসংখ্যার যে পরিবর্তন হয় তা জনসংখ্যা ট্রানজিশন মডেল বর্ণনা করে। প্রখ্যাত মার্কিন ভূগোলবিদ ওয়ারেন থম্পসন ১৯২৯ সালে এ মডেলটি উপস্থাপন করেন। জনসংখ্যার অবস্থানগত পরিবর্তন, বিশেষ করে জন্ম ও মৃত্যুহারের পরিবর্তন ধারার উপর ভিত্তি করে এ মডেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জন্মহার উচ্চ থাকে, তবে মৃত্যুহার হ্রাস পায়। তৃতীয় পর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই নিম্নমুখী হয় এবং চতুর্থ পর্যায়ে মৃত্যুর ফলে জনসংখ্যার যে হ্রাস ঘটে, জন্মের ফলে তা পূরণ নাও হতে পারে। ফলে এ পর্যায়ে জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল থাকে। বাংলাদেশের জন্ম ও মৃত্যুহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মডেলটির দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষভাগে এবং তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জনমিতিক ট্রানজিশন মডেলটি কীসের সাথে সম্পৃক্ত?

(ক) সম্পদ (খ) অর্থ (গ) পরিবেশ (ঘ) জনসংখ্যা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ২, ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পৃথিবীর জনসংখ্যার আকার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কারণ মানুষের জন্ম ও মৃত্যুহার সবসময় সর্বত্র একই থাকে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে জনসংখ্যার যে পরিবর্তন হয় তা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে একটি মডেলের মাধ্যমে বর্ণনা করেন ওয়ারেন থম্পসন।

২। আলোচ্য মডেলটি কত সালে উপস্থাপন করা হয়?

(ক) ১৯১৯ (খ) ১৯২৯ (গ) ১৯৩৯ (ঘ) ১৯৪৯

৩। উল্লিখিত মডেলের তৃতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হলো–

i. জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই ঊর্ধ্বগামী ii. জন্মহার অধিক, মৃত্যুহার কম iii. জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই নিম্নমুখী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশ আলোচ্য মডেলের কোন পর্যায়ে রয়েছে?

(ক) প্রথম পর্যায়ের শেষ প্রান্তে (খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ প্রান্তে

(গ) তৃতীয় পর্যায়ের শেষ প্রান্তে (ঘ) চতুর্থ পর্যায়ের শেষ প্রান্তে

পাঠ-৩.৪ অভিগমন ও প্রকারভেদ (Migration and Types)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভিগমন বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন প্রকার অভিগমন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

অভিগমন

আমাদের চারপাশের অসংখ্য মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিনিয়ত একস্থান থেকে অন্যস্থানে, একদেশ থেকে অন্যদেশে গমন করছে। যেমন-কর্মসূত্রে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন, জীবিকানির্বাহের জন্য গমন, ব্যবসা, বাণিজ্যের জন্য গমন প্রভৃতি। মানুষের এই গমন কখনো স্থায়ী আবার কখনোবা অস্থায়ী হয়ে থাকে। এ সকল যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ নিজের আবাসস্থল পরিবর্তন করে অন্যত্র সুবিধাজনক স্থানে বসবাস করে। মানুষের এরূপ স্থায়ী বা অস্থায়ী আবাসের পরিবর্তনই হলো অভিগমন। জাতিসংঘের মতে, এক বা একাধিক বছরের জন্য বাসস্থানের পরিবর্তনকে অভিগমন বলে। Brain Goodall এর মতে, "Migration is the permanent or semi permanent change of a person's place of residence"। E.S. Lee অভিগমন সম্পর্কে বলেন, "বাসস্থানের স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তনই হলো অভিগমন।'

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মানুষের বাসস্থানের স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোনো ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হলে তা অভিগমনের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ অভিগমনের ক্ষেত্রে অবশ্যই বাসস্থানের পরিবর্তন হতে হবে। যা স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোনো ধরনের হতে পারে। এক্ষেত্রে মানুষ যে স্থান ত্যাগ করে তাকে উৎসস্থল (Place of Origin) এবং নতুন যে স্থানে গমন করে সে স্থানকে গন্তব্যস্থল (Place of Destination) বলে।

অভিগমনের প্রকারভেদ : অভিগমনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. প্রকৃতি অনুযায়ী অভিগমন এবং
খ. স্থানভেদে অভিগমন।

ক. প্রকৃতি অনুযায়ী অভিগমন : অনেক সময়ে মানুষ নিজের ইচ্ছায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। আবার অনেক সময় নিজ বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তাই এ ধরনের অভিগমনকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অবাধ অভিগমন এবং বলপূর্বক অভিগমন।

১. অবাধ অভিগমন (Free Migration) : অবাধ অভিগমনে অভিগমনকারীর গন্তব্যস্থলের স্বাধীনতা থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় আবাস স্থান ত্যাগ করে অন্য কোনো পছন্দমতো স্থানে আবাস গড়ে তোলে তখন তাকে অবাধ অভিগমন বলে। উৎস স্থানের বিভিন্ন অভাব (যেমন-কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি) এবং গন্তব্যস্থানের অধিক সুযোগ-সুবিধার কারণে এ ধরনের অভিগমন ঘটে থাকে। আমাদের দেশের অনেক লোক এসব সুবিধা প্রাপ্তির জন্য গ্রাম থেকে শহরে আবাস গড়ে তোলে।

২. বলপূর্বক অভিগমন (Forced Migration) : অনেক সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক চাপ, সহিংসতা, জাতিগত দ্বন্দ্ব, অর্থনৈতিক মন্দা বা নানাবিধ সামাজিক কারণে মানুষ নিজ আবাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং অন্যত্র গিয়ে আবাস গড়ে তোলে। এ ধরনের বাধ্য হয়ে অভিগমনকে বলপূর্বক অভিগমন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইরাক যুদ্ধে বহু লোক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বলপূর্বক অভিগমনের ফলে যে সমস্ত ব্যক্তি কোনো স্থানে আগমন করে এবং স্থায়ী আবাস স্থাপন করে তাদেরকে উদ্বাস্তু (Refugee) বলে। আর যারা সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সুবিধামত সময়ে নিজ দেশে ফিরে যায় তাদেরকে বলা হয় শরণার্থী (Emigree)।

খ. স্থানভেদে অভিগমন : স্থানভেদে অভিগমনকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমন এবং আন্তর্জাতিক অভিগমন।

১. অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমন (Intra-state Migration) : অন্ত:রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি যখন আবাসস্থান পরিবর্তন করে তখন তাকে অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমন বলে। এ ধরনের অভিগমন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়। যেমন- ঠাকুরগাঁও থেকে কেউ যদি বন্দরনগরী চট্টগ্রামে এসে বসবাস করে তখন তাকে অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমন বলে। অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিগমনকে আবার পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো:

ক. গ্রাম থেকে গ্রামে অভিগমন (Rural to Rural Migration) : কোনো ব্যক্তি যখন একই দেশের অভ্যন্তরে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে বসবাস করে তখন তাকে গ্রাম থেকে গ্রাম অভিগমন বলে। আমাদের দেশে সাধারণত মৌসুমী কাজের সন্ধানে এবং বৈবাহিক কারণে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে অভিগমন অধিক হয়ে থাকে।

খ. গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন (Rural to Urban Migration) : কোনো ব্যক্তি যখন একই দেশের অভ্যন্তরে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন বলে। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের অভিগমন বেশি হয়। উন্নত দেশগুলোতেও গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন দেখা যায়। সাধারণত কর্মসংস্থান, চাকুরি, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন হয়ে থাকে।

গ. শহর থেকে গ্রামে অভিগমন (Urban to Rural Migration) : শহরে বসবাসরত কোনো মানুষ যখন গ্রামে গিয়ে আবাস গড়ে তোলে তখন তাকে শহর থেকে গ্রামে অভিগমন বলে। আমাদের দেশে এ ধরনের অভিগমন খুব কম দেখা যায়। সাধারণত চাকুরি থেকে অবসরের পর এ ধরনের অভিগমন ঘটে থাকে। তবে উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের অভিগমন বেশি দেখা যায়।

ঘ. শহর থেকে শহরে অভিগমন (Urban to Urban Migration) : কোনো ব্যক্তি যখন একই দেশের অভ্যন্তরে এক শহর থেকে অন্য শহরে আবাসস্থল পরিবর্তন করে তখন তাকে শহর থেকে শহরে অভিগমন বলে। চাকুরি, উন্নত জীবনযাত্রা প্রভৃতি কারণে এ ধরনের অভিগমন হয়ে থাকে। যেমন-রংপুর শহর থেকে ঢাকা শহরে গমন।

ঙ. অন্ত:নগর অভিগমন (Intra Urban Migration) : একই নগরের অভ্যন্তরে যখন কোনো ব্যক্তি একস্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে বসবাস করে তখন তাকে অন্ত:নগর অভিগমন বলে। যেমন-রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডি থেকে উত্তরায় গিয়ে বসবাস করা অন্ত:নগর অভিগমনের উদাহরণ।

২. আন্তর্জাতিক অভিগমন (International Migration) : কোনো দেশের মানুষ যখন নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে গিয়ে বসবাস করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক অভিগমন বলে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমানা অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে। তবে ইচ্ছা করলেই আন্তর্জাতিক অভিগমন করা যায় না। এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ আন্তর্জাতিক অভিগমনের উৎস এবং গন্তব্যস্থল উভয়ের নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অভিগমন সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, চীন, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র ও অঞ্চলের মধ্যে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা–

ক. অন্ত:মহাদেশ অভিগমন (Intra Continent Migration) : একই মহাদেশভুক্ত একদেশ থেকে অন্যদেশে গিয়ে আবাস গড়ে তুললে তাকে অন্ত:মহাদেশ অভিগমন বলে। যেমন-এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরব বা জাপানে অভিগমন।

খ. আন্ত:মহাদেশ অভিগমন (Inter Continent Migration) : এক মহাদেশভুক্ত দেশ থেকে অন্য মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশে গিয়ে বসবাস করলে তাকে আন্ত:মহাদেশ অভিগমন বলে। যেমন- এশিয়া মহাদেশের বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের যুক্তরাজ্যে বা উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এশিয়ার জাপানে অভিগমন।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, এই পাঠে আমরা অভিগমন এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে জানলাম। পরের পাঠে অভিগমনের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে জানব।

শিক্ষার্থীর কাজ	অভিগমনের শ্রেণিবিভাগ ছকবদ্ধ করে প্রত্যেকটির উদাহরণ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে প্রতিনিয়ত একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করছে। মানুষের এরূপ এক বা একাধিক বছরের জন্য বাসস্থানের পরিবর্তনই হলো অভিগমন। অভিগমনকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-প্রকৃতি অনুযায়ী অভিগমন এবং স্থানভেদে অভিগমন। প্রকৃতি অনুযায়ী অভিগমন আবার দুই প্রকার। যথা- অবাধ অভিগমন এবং বলপূর্বক অভিগমন। একইভাবে স্থানভেদে অভিগমন দুই প্রকার। যথা- অন্ত:রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিগমন। অন্ত:রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিগমনের আবার কতকগুলো উপভাগ রয়েছে। অর্থাৎ অভিগমন বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তবে যে ধরনের অভিগমন হোক না কেন এর ফলে উৎস ও গন্তব্য স্থানের জনসংখ্যার আকারগত পরিবর্তন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। অভিগমন প্রধানত কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২। অভিগমনে মানুষ যে স্থান ত্যাগ করে তাকে কী বলে?

(ক) গন্তব্যস্থল (খ) লক্ষ্যস্থল (গ) বিশেষ অঞ্চল (ঘ) উৎসস্থল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ থেকে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনাব ফজলুর রহমানের বাড়ি পঞ্চগড় জেলায় লোহাকাঁচী গ্রামে। তিনি প্রয়োজনের তাগিদে কয়েক বছর ধরে ঢাকায় বসবাস করছেন। মাঝে মাঝে গ্রামে যান এবং সবার খোঁজ-খবর নেন। এরপর আবার ঢাকায় ফিরে আসেন।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটি কী নির্দেশ করছে?

(ক) অভিগমন (খ) সরকারি ভ্রমণ (গ) শিক্ষা ভ্রমণ (ঘ) কোনটিই নয়

৪। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন ধরনের অভিগমন ঘটেছে?

(ক) গ্রাম থেকে শহরে (খ) শহর থেকে গ্রামে (গ) শহর থেকে শহরে (ঘ) কোনটিই নয়

৫। আন্তর্জাতিক অভিগমনের উদাহরণ-

i. ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে গমন ii. পঞ্চগড় থেকে ঢাকা গমন iii. বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়া গমন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ অভিগমনের কারণ ও প্রভাব (Causes and Effects of Migration)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভিগমনের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- অভিগমনের ফলে সৃষ্ট প্রভাব জানতে পারবেন।

অভিগমনের কারণ

মানুষ সাধারণত প্রয়োজনের তাগিদে নতুবা বাধ্য হয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। আদিকাল থেকেই মানুষের এই গমন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তখনকার দিনে মানুষ খাবার ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়াতো। কালক্রমে মানুষের চাহিদার পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় অভিগমনের কারণও বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। অভিগমন প্রক্রিয়ায় একদিকে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে গন্তব্যস্থলের সুযোগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ইত্যাদি আকর্ষণ করে। অপরদিকে, উৎস স্থানের সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা বা অনুপস্থিতি, অসন্তোষ, অস্থিরতা বা দুর্যোগজনিত অবস্থা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অভিগমনের এ দুইটি বিপরীতমুখী অবস্থাকে যথাক্রমে আকর্ষণ (Pull) এবং বিকর্ষণ (Push) অর্থাৎ Push-Pull উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (চিত্র-৩.৫.১)। তবে অন্তর্বর্তীকালীন বাঁধাসমূহ অভিগমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অভিগমনের উপাদানগুলো সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান নয়। ফলে অভিগমন সর্বত্র সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারে না। নিম্নে অভিগমনের প্রধান কারণসমূহ আলোচনা করা হলো।

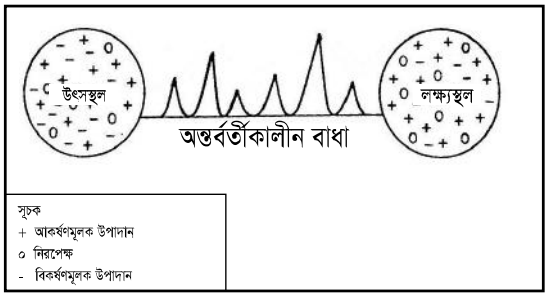

চিত্র-৩.৫.১ : অভিবাসনের আকর্ষণ-বিকর্ষণজনিত সম্পর্ক

১. অর্থনৈতিক : মানুষ তার অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। অর্থের প্রয়োজনে দেশের অভ্যন্তরে অথবা দেশের বাইরেও অভিগমন করতে পারে। সাধারণত অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ বা অঞ্চলে মানুষ অধিক গমন করে থাকে।

২. জীবিকার সন্ধান : জীবিকার সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে চলেছে। যেমন-বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকা থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর প্রভৃতি শহরে জীবিকার সন্ধানে মানুষ ছুটছে। আবার আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জীবিকার সন্ধানে অভিগমন করছে।

৩. চাকুরি : সরকারি-বেসরকারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত লোকজন একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে যা অভিগমনের একটি অন্যতম কারণ। বর্তমানে বহুমুখী চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় এটি অভিগমনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

৪. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : গ্রামের তুলনায় শহরে, ছোট শহরের তুলনায় বড় শহরে, অনুন্নত দেশের তুলনায় উন্নত দেশে জীবনযাত্রার মান ভালো হওয়ায় মানুষ এ সকল স্থানের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা করে।

৫. বিশ্বায়ন : অভিগমনের একটি অন্যতম কারণ বিশ্বায়ন। বিশ্বায়নের ফলে মানুষের কাছে সবকিছুই সহজ হয়েছে। মার্শাল ম্যাক লুহান পৃথিবীকে 'গ্লোবাল ভিলেজ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৬. নগরায়ন ও শিল্পায়ন : নগরায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পেলে গ্রামীণ এলাকা থেকে মানুষ নগরে এসে বসবাস শুরু করে। সাধারণত সুযোগ-সুবিধা অধিক থাকায় মানুষ নগরমুখী হয়ে থাকে। যা নগর এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। নগর এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, অফিস-আদালত প্রভৃতির আধিক্য থাকায় তা সহজেই মানুষকে

অভিগমনে আকৃষ্ট করে থাকে। নগর এলাকায় শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের আশেপাশে মানুষের ঘনত্ব বেশি হয়ে থাকে এবং শ্রমজীবি মানুষের একটি বড় অংশ বস্তিতে নিম্নতর জীবনযাপন করে।

৭. পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি : পরিবহন ব্যবস্থার উপর অভিগমন অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে পরিবহন ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত এবং কষ্টসাধ্য ছিল বলে তখন অভিগমন ছিল ধীরগতির। বর্তমানে পরিবহন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব অগ্রগতি হওয়ায় অভিগমনের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধি : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অনেকে অভিগমনে বাধ্য হয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে বা চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা অন্যত্র গমন করে থাকে। এর ফলে জনবহুল দেশ বা অঞ্চল থেকে জনঘাটতি দেশ বা অঞ্চলে অভিগমন ঘটে থাকে।

৯. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : অভিগমনের একটি অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূমিকম্প, নদীভাঙন, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ প্রভৃতি থেকে রক্ষা পেতে অনেকেই অভিগমন করে থাকে। যেমন- বর্ষা মৌসুমে পদ্মা নদীর ভাঙনের ফলে প্রতি বছরই নদী তীরবর্তী বহু মানুষ অন্যত্র অভিগমন করে থাকে।

১০. উচ্চ শিক্ষা : বর্তমান সময়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় অভিগমন ঘটছে। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মানুষ গ্রাম থেকে শহরে বা দেশের বাইরে গমন করছে। অনেকে শিক্ষা জীবন শেষে সেখানেই চাকুরির ব্যবস্থা করে থেকে যায়।

১১. জাতিগত দ্বন্দ্ব ও সামাজিক অস্থিরতা : অভিগমনের অন্যতম কারণ জাতিগত দ্বন্দ্ব ও সামাজিক অস্থিরতা। যেমন- মিয়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক লোক জীবন রক্ষার তাগিদে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

১২. সাংস্কৃতিক কারণ : সাংস্কৃতিক কারণও অভিগমনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উন্নত ও মুক্ত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি মানুষ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে অভিগমন করে থাকে।

উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অভিগমন প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। এর ফলে মানুষ দ্রুত এবং অনায়াসে অভিগমন করছে।

অভিগমনের প্রভাব : অভিগমনের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে অভিগমনের উল্লেখযোগ্য প্রভাবসমূহ বর্ণনা করা হলো-

১. জনসংখ্যার পরিবর্তন : অভিগমনে উৎস ও গন্তব্যস্থলের জনসংখ্যা পরিবর্তিত হয়। এর ফলে যত লোক উৎসস্থল ত্যাগ করে তত সংখ্যক লোক গন্তব্যস্থলে যুক্ত হয়। এতে উৎসস্থলে লোক কমে গিয়ে গন্তব্যস্থলে বৃদ্ধি পায়। যেমন-বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের লোক রাজধানী ঢাকার দিকে গমন করছে এবং ধারণ ক্ষমতায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা বহন করছে।

২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন : সাধারণত কর্মের সন্ধানে অধিকাংশ মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। গন্তব্যস্থলে যে কোনো ধরনের কর্মই হোক না কেনো কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। এতে অভিগমনকারীর জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন হয়। তবে বস্তি এলাকায় বসবাসকারী অভিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না। আবার আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে অভিগমনকারী পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয় এবং অভিবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সে দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হয়।

৩. শহরে বেকারত্ব বৃদ্ধি : যেসব শহরে অধিক হারে অভিগমনকারী আগমন করে সেসব শহরে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। কারণ অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

৪. পরিবেশগত প্রভাব : পরিবেশের উপর অভিগমনের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। সাধারণত শহরাঞ্চলে অভিগমন অধিক হওয়ায় প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় পরিবেশই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যেমন-শহরে অধিক জনসংখ্যার কারণে অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ি ও বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে উঠে। একই সাথে নিম্ন আয়ের মানুষ বস্তি এলাকায় বসবাস করে যা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। শহরাঞ্চলে অভিগমনের হার বেশি হওয়ায় বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াসহ জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়ে। এতে পরিবেশের ভারসাম্যের উপর প্রভাব পড়ে।

৫. পেশাগত পরিবর্তন : অভিগমনের ফলে অনেকের পেশার পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন- গ্রামের একজন কৃষি শ্রমিক যদি শহরে অভিগমন করে রিক্সা চালায় তাহলে তার পেশাগত পরিবর্তন ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক পেশা পরিবর্তন করে অকৃষি পেশায় সম্পৃক্ত হয়। আবার অনেকে একটি চাকুরি পরিবর্তন করে অন্য চাকুরিতে প্রবেশ করে পেশার পরিবর্তন ঘটায়।

৬. **অর্থনৈতিক গতিশীলতা :** অভিগমনের ফলে অভিগমনকারীর পরিবারে অর্থনৈতিক গতিশীলতা দেখা যায়। যেমন- কোনো ব্যক্তি গ্রাম থেকে শহরে গমন করলে শহর থেকে গ্রামে অর্থ প্রেরণ করে অথবা বিদেশে অভিগমন করলে দেশে বসবাসরত পরিবারের জন্য অর্থ প্রেরণ করে। এতে গ্রামীণ বা শহুরে পরিবারটি অর্থনৈতিকভাবে গতিশীল হয়।

৭. ভাষার পরিবর্তন : গন্তব্যস্থলে ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে অনেক ক্ষেত্রে ভাষার পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন-কোনো ব্যক্তি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললেও শহরে অভিগমন করলে তাকে শহরের ভাষা আয়ত্ব করতে হয়। আবার আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. **সামাজিক অস্থিরতা :** অনেক সময় অতিরিক্ত অভিগমনের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, আইন-শৃঙ্খলার অবনতিসহ বিরূপ প্রভাব দেখা দিতে পারে। এতে গন্তব্যস্থলে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়।

অভিগমনের ফলে উপরিউক্ত প্রভাবসমূহ ছাড়াও খাদ্যাভাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতিনীতি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং বলা যায় যে, অভিগমনের ফলে ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনে বহুবিধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার বিভিন্ন মানুষের অভিগমনের কারণ এবং এর ফলে কী ধরনের প্রভাব দেখা যায় তা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

সব ধরনের অভিগমনের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো কারণ নিহিত থাকে। আদিকাল থেকেই মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে আসছে। মানুষের এই অভিগমন প্রক্রিয়ায় একদিকে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে উৎসস্থানের সুযোগ-সুবিধার অভাব বা অনুপস্থিতি মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে। অন্যদিকে গন্তব্যস্থানের সুযোগ-সুবিধা বা সম্ভাবনা অনুকূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। সাধারণত অর্থনৈতিক, জীবিকার সন্ধান, চাকুরি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বিশ্বায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উচ্চ শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, জাতিগত বা সামাজিক অস্থিরতা প্রভৃতি কারণে অভিগমন করে থাকে। অভিগমনের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন-জনসংখ্যার আকারগত পরিবর্তন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন, শহরে বেকারত্ব বৃদ্ধি, পরিবেশগত প্রভাব, ভাষা ও পেশাগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক গতিশীলতা, সামাজিক অস্থিরতা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অভিগমনের ফলে কী হয়?

(ক) জনসংখ্যার পরিবর্তন (খ) কর্মসংস্থান

(গ) অর্থনৈতিক গতিশীলতা (ঘ) সবগুলো সঠিক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সালমা তিস্তা নদীর তীরে পরিবারের সাথে বসবাস করেন। এক বর্ষায় নদীভাঙনে তারা গৃহহীন হয়ে পড়লেন। এরপর জীবিকা ও আশ্রয়ের সন্ধানে স্বপরিবারে শহরে চলে গেলেন।

২। সালমার পরিবারের বাসস্থানের এই পরিবর্তনকে কী বলে?

(ক) অভিগমন (খ) প্রমোদ ভ্রমণ (গ) শিক্ষা ভ্রমণ (ঘ) স্বেচ্ছা ভ্রমণ

৩। অভিগমনের কারণ হলো-

i. চাকুরি ii. আশ্রয়ের সন্ধান iii. জীবিকার সন্ধান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৬ বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ (Population Distribution in Bangladesh and its Causes)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যার বণ্টন বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন;
- ঘনত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যার বন্টন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

জনসংখ্যার বণ্টন

জনসংখ্যার বণ্টন হলো স্থানভেদে জনসংখ্যার বিন্যাস অর্থাৎ কোনো স্থানে জনসংখ্যা বসবাসের ধরণই জনসংখ্যা বণ্টন। বিশ্বের অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও জনসংখ্যার বণ্টন সর্বত্র সমান নয়। দেশের কোথাও রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের আবাস আবার কোথাওবা স্বল্প মানুষের আবাস। জনসংখ্যা বণ্টন নির্ভর করে মূলত ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উপর।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বণ্টন ও কারণ (Population Distribution in Bangladesh and its Causes) : ঘনত্বের পার্থক্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টনকে প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

ক. নিবিড় জনবসতি অঞ্চল এবং

খ. বিরল জনবসতি অঞ্চল।

ক. **নিবিড় জনবসতি অঞ্চল (Intensive Populated Region) :** বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বাধিক সে সকল অঞ্চলকে নিবিড় জনবসতি অঞ্চল বলে। এ অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২০০০ জনের অধিক লোক বাস করে। নিবিড় জনবসতি অঞ্চলের সর্বত্র জনসংখ্যার ঘনত্ব সমান নয় বলে একে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো–অতি নিবিড় বসতি অঞ্চল, নিবিড় বসতি অঞ্চল এবং নাতি নিবিড় বসতি অঞ্চল।

১. **অতি নিবিড় বসতি অঞ্চল :** রাজধানী ঢাকা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ঢাকা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৮,২৩২ জন লোক বাস করে। আবার ঢাকা জেলার মধ্যে অবস্থিত ঢাকা মহানগরীর জনবসতি সবচেয়ে ঘন। ঘনত্বের দিক দিয়ে ঢাকা মহানগরীর কোতোয়ালী থানা প্রথম স্থানে রয়েছে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫০০ জন লোক বাস করে। এরপরই রয়েছে সূত্রাপুর থানা। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৮৮২৫০ জন বাস করে। মোহাম্মদপুরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৩৭,২২২ জন এবং তেজগাঁয়ে ৩৩,৫৫৫ জন লোক বাস করে (বিবিএস-২০১২)। এছাড়া ঢাকা মহানগরীর অন্যান্য থানাতেও জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যধিক। মহানগরীর বাইরে অবস্থিত সাভার, ধামরাই, দোহার প্রভৃতি থানার জনসংখ্যার ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

অতি নিবিড় বসতি গড়ে উঠার কারণ : ঢাকা রাজধানী শহর হওয়ায় এখানে অতি নিবিড় বসতি গড়ে উঠেছে। সকল প্রকার প্রশাসনিক ও অন্যান্য অফিসের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষের লক্ষ্যস্থল ঢাকা। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প-কারখানা, কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা, বহুতল ভবনের আধিক্য, ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রভৃতি কারণে এ অঞ্চলটি অতি জনবহুল। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার উর্বর মৃত্তিকা এবং উৎপাদনশীলতাও প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

২. **নিবিড় বসতি অঞ্চল :** যে সকল অঞ্চলে ১,৫০১ থেকে ২,০০০ জন লোক বাস করে সে সকল এলাকা নিবিড় বসতি অঞ্চল হিসেবে গণ্য করা হয়। ঢাকার পরেই জনবহুল অঞ্চল হিসেবে সুপরিচিত নারায়নগঞ্জ। নারায়নগঞ্জ জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ৪,৩১০ জন লোক বাস করে। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বাধিক।

নিবিড় বসতি গড়ে উঠার কারণ : পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা থাকায় এ জেলায় নিবিড় বসতি গড়ে উঠেছে। এখানে অসংখ্য শিল্প-কারখানা রয়েছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। এসব কারণে নারায়নগঞ্জকে 'প্রাচ্যের ডান্ডি' বলে অভিহিত করা হতো। এছাড়া ঐতিহাসিকভাবেও এ জেলা গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজধানী ঢাকার সন্নিকটে অবস্থিত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিবিড় বসতি গড়ে উঠেছে।

৩. **নাতি নিবিড় বসতি অঞ্চল :** যে সকল অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০০১ থেকে ১৫০০ জনের মধ্যে সে সকল অঞ্চলকে নাতি নিবিড় বসতি অঞ্চল বলে। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রংপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, কুষ্টিয়া, ফেনী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলা নাতি নিবিড় বসতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

নাতি নিবিড় বসতি গড়ে উঠার কারণ : চট্টগ্রাম মহানগরীতে জনসংখ্যা ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ার কারণ সমুদ্রবন্দরের অবস্থান এবং শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। গাজীপুর জেলাতেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিল্প-কারখানার ব্যাপক প্রসার ঘটায় জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়া অন্যান্য জেলাসমূহ কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় নাতি নিবিড় বসতি গড়ে উঠেছে।

খ. **বিরল জনবসতি অঞ্চল:** যে সকল অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০০ জনের কম লোক বাস করে সে সকল অঞ্চলকে বিরল জনবসতি অঞ্চল বলে। জনসংখ্যার ঘনত্বের উপর ভিত্তি করে বিরল জনবসতি অঞ্চলকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- নাতি বিরল বসতি অঞ্চল এবং অতি বিরল বসতি অঞ্চল।

১. নাতি বিরল বসতি অঞ্চল : যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০১-১০০০ জনের মধ্যে জনসংখ্যার আবাস থাকে সেসব অঞ্চলকে নাতি বিরল বসতি অঞ্চল বলে। পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, রাজবাড়ি, মাগুরা, গোপালগঞ্জ, খুলনা, যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নড়াইল, পিরোজপুর, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা প্রভৃতি জেলা নাতি বিরল বসতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

নাতি বিরল বসতি গড়ে উঠার কারণ : নাতি বিরল বসতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে নতুনভাবে পলি সঞ্চিত না হওয়ায় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তুলনামূলক কম হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে সিলেট ও কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের হাওর বা বিল এলাকায় জলমগ্নতার জন্য জনবসতি কম। বৃহত্তর দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও যশোরের কোনো কোনো অংশে জমি অনুর্বর হওয়ায় সেসব জায়গায় জনবসতি কম। উপকূলীয় জেলাসমূহে লবণাক্ততা, জলোচ্ছ্বাস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি থাকায় নাতি বিরল বসতি গড়ে উঠেছে। এছাড়া শিল্প-কারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার কম থাকার কারণেও জনবসতি নাতি বিরল।

২. অতি বিরল বসতি অঞ্চল : যে সকল অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রতি বর্গকিলোমিটারে ০-৫০০ জন, সেসব এলাকাকে অতি বিরল বসতি অঞ্চল বলে। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, মধুপুর ও বাওয়ালের গড়, সুন্দরবন, বরগুনা, পটুয়াখালি এবং বাগেরহাট জেলা অতি বিরল বসতি অঞ্চলভুক্ত। পাহাড়ি জেলাগুলোর মধ্যে বান্দরবানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৭ জন, রাঙামাটিতে ৯৭ জন, খাগড়াছড়িতে ২৩৩ জন লোক বাস করে।

অতি বিরল বসতির কারণ : পাহাড়িয়া অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত, অনুর্বর মৃত্তিকা, দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা, কষ্টসাধ্য জীবনযাত্রা অতি বিরল বসতির প্রধান কারণ। পার্বত্য বালুকাময়, অসমতল ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহ ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কষ্টসাধ্য হওয়ায় জনবসতি কম গড়ে উঠেছে। আবার মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অঞ্চলে অনুর্বর জমিতে কৃষিকাজের সুবিধা না থাকায় জনবসতি কম। একইভাবে সুন্দরবনের বিস্তৃত লবণাক্ত বনাঞ্চলে অতি বিরল বসতি দেখা যায়।

এছাড়া এসব অঞ্চল কাগজ, রেয়ন ও কাঠভিত্তিক শিল্প ব্যতিরেকে অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনি। তবে সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলে চা শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। ফলে এখানে বেশ কিছু শ্রমিকের আবাস গড়ে উঠেছে।

গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার বণ্টন

বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। আবহমানকাল থেকে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে আসছে। তবে সাম্প্রতিক কয়েক দশকে শহুরে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। নগরায়ন, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ বহুবিধ কারণে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকাতেও আধুনিক সুযোগ-সুবিধার প্রসার ঘটছে। আমরা যদি গ্রামীণ ও শহরে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার দেখি তাহলে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৮৫% এবং শহরে ৩.৮৬%। গত শতকের সত্তর এবং আশির দশকে শহরে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল সবচেয়ে বেশি। আর ২০১১ সালে শহরে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪৮%, যেখানে গ্রামীণ প্রবৃদ্ধির হার ১.৩১%। সারণি ৩.৬.১-এ বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরে জনসংখ্যার বণ্টন এবং প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলো।

সারণি ৩.৬.১: বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার বণ্টন ও প্রবৃদ্ধির হার

সাল	গ্রামীণ জনসংখ্যা		শহুরে জনসংখ্যা	
	জনসংখ্যা (কোটি)	প্রবৃদ্ধির হার (%)	জনসংখ্যা (কোটি)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯৫০	৪.০০	১.৮৫	০.১৮	৩.৮৬
১৯৬০	৪.৮৫	২.১০	০.২৬	৬.১৫
১৯৭০	৫.৯৯	১.৯১	০.৫০	৭.৫৮
১৯৮০	৬.৯৯	১.৮১	১.২২	৫.৬৮
১৯৯০	৮.৩৪	১.৮২	২.০৬	৩.৯৪
২০০০	৯.৯	১.৫৯	২.৯৯	৩.৫৭
২০১১	১১.০৫	১.৩১	৩.৩৬	৩.৪৮

উৎস: ইউএনএফপিএ-২০০৭ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০১৩

সারণি ৩.৬.১ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত এর পেছনে নতুন নতুন নগর ও শহর গড়ে উঠা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি মানুষকে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ঘনত্ব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বণ্টনের শ্রেণিবিভাগকে ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বণ্টন সর্বত্র সমান নয়। ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা, কর্মসংস্থান, পরিবহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করে জনসংখ্যার বণ্টনে ভিন্নতা দেখা যায়। ঘনত্বের পার্থক্য অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টনকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- নিবিড় জনবসতি অঞ্চল এবং বিরল জনবসতি অঞ্চল। নিবিড় জনবসতি অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি। আর বিরল জনবসতির মধ্যে রয়েছে বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঘনত্বের পার্থক্য অনুযায়ী জনসংখ্যা বন্টনকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। নাতি বিরল বসতি অঞ্চলের জনসংখ্যা কত?
(ক) ০ থেকে ৫০০ জন (খ) ৫০১ থেকে ১০০০ জন
(গ) ১০০১ থেকে ১৫০০ জন (ঘ) ১৫০১ থেকে ২০০০ জন

৩। অতি বিরল বসতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত-
i. বান্দরবান ii. রাজশাহী iii. খাগড়াছড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

আমাদের দেশে পাহাড়ি অঞ্চলে জনসংখ্যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম। রাজধানী ঢাকায় ঠিক তার উল্টো চিত্র। এখানে সারা দেশ থেকে বহু মানুষ কর্মের সন্ধানে ছুটে আসে।

৪। কোন জেলাটি অতি নিবিড় বসতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) চট্টগ্রাম (খ) কুমিল্লা (গ) ঢাকা (ঘ) চাঁদপুর

৫। আলোচ্য অঞ্চলে জনসংখ্যা কম হওয়ার কারণ-
i. উর্বর মৃত্তিকা ii. কষ্টসাধ্য জীবন iii. অসমতল ভূ-প্রকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৭ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব (Effects of Population Growth in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

কোনো দেশ বা অঞ্চলের জন্য জনসংখ্যা যেমন অপরিহার্য তেমনি আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হলে ঐ অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের জন্য চাপ হিসেবে দেখা দেয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার যা পৃথিবীর তিন হাজার ভাগের একভাগ অথচ জনসংখ্যায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। এদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করছে ১০৯৬ জন। অথচ উন্নত দেশসমূহ যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৫ জন, যুক্তরাজ্যে ২৬৭ জন, জাপানে ৩৪৯ জন, কানাডায় ৪ জন, সুইজারল্যান্ডে ৭৪ জন লোক বাস করে (পিআরবি-২০১৬)। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটার জনসংখ্যার বসবাস ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সবক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান প্রভাবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

১. কৃষি জমি হ্রাস : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি জমি হ্রাস পায়। দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও দেশের আয়তন বাড়ছে না। ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবকাঠামো নির্মাণে কৃষি জমি ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির বিভক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আইল দেওয়ার কারণে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এতে ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষি প্রধান এদেশের কৃষি জমির উপর সরাসরি প্রভাব পড়ছে।

২. চাকুরি ও কর্মসংস্থানে প্রভাব এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি : অতিরিক্ত জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাকুরি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এতে চাকুরি সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব পড়ছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাকুরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের বেকার লোক রয়েছে। যেমন- শিক্ষিত বেকার, অশিক্ষিত বেকার, স্থায়ী বেকার, অস্থায়ী বেকার, ঋতুভিত্তিক বেকার প্রভৃতি। সুতরাং অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে বেকার লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দেখা দিবে।

৩. খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা : জীবনধারনের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি অত্যাবশ্যক। জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান করা দেশীয় উৎপাদন দ্বারা দূরুহ হয়ে পড়ে। এতে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয় এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়, যা দেশীয় অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। এছাড়া বিপুল জনগোষ্ঠির পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার সংস্থান করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে। এতে শিশু অবস্থা থেকে অনেকেই অপুষ্টির শিকার হয়। বিশেষ করে বস্তি এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী নিম্নআয়ের মানুষ অপুষ্টির শিকার বেশি হয়ে থাকে। ফলে সমাজের একটি অংশ অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে না।

৪. বাসস্থানের উপর প্রভাব : জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাসস্থানের সমস্যাও বৃদ্ধি পায়। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। বাসস্থানের সংস্থান করতে গিয়ে কৃষি ও অকৃষি জমি ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে বাসস্থানের সংকট বেশি। শহরে বসবাসকারী বেশিরভাগ লোকের শহরে নিজস্ব ঘরবাড়ি নেই। এছাড়া শহরে ছিন্নমুল মানুষের সংখ্যাও কম নয়। এসব ছিন্নমূল মানুষ রেললাইন, রাস্তা বা ফুটপাতে বসবাস করে। যা সকল মানুষের মৌলিক অধিকার বাসস্থানের উপর প্রভাব পড়ে।

৫. সুপেয় পানির উপর প্রভাব : জীবনধারনের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান সুপেয় পানি। দেশের বিভিন্ন স্থানে আর্সেনিকযুক্ত পানি, উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত পানি, নগর এলাকায় বিশেষ করে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং চট্টগ্রামে জনসংখ্যার অব্যাহত চাপ থাকায় বর্ধিত জনগোষ্ঠির জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার উপর প্রভাব পড়ে। এছাড়া

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার ফলেও সুপেয় পানি সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ে। অদূর ভবিষ্যতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য সুপেয় পানি নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৬. **শিক্ষা ও চিকিৎসার উপর প্রভাব :** অতিরিক্ত জনসংখ্যা হলে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। দেশে শিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা অধিক হলে একই শ্রেণিকক্ষে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে হয় এবং শিক্ষার গুণগতমানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। ফলে জনগণের পর্যাপ্ত চিকিৎসার উপর প্রভাব পড়ে। সরকারি হাসপাতালে সকলের পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম, ঔষুধ, ডাক্তার নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর বেসরকারি খাতের চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হওয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির পক্ষে তা সম্ভব হয় না।

৭. **আয় ও জীবনযাত্রার মান :** জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেলে মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মানের উপর প্রভাব পড়ে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা অধিক হলে চাহিদা পূরণ করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সীমিত আয় দিয়েই পরিবারের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করতে হয়। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠি জীবনযাত্রার কাঙ্খিত মান নিশ্চিত করতে পারে না।

৮. **কাঁচামাল ও শিল্প উৎপাদনে প্রভাব :** বাংলাদেশ ভারী শিল্পে উন্নত না হলেও কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার শিল্পের অন্যতম প্রধান উৎস কৃষি উৎপাদিত পণ্য। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কৃষি জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া বিপুল জনগোষ্ঠির মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অতিরিক্ত পুঁজি ব্যয় করতে হয়। ফলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৯. **যাতায়াত ব্যবস্থার উপর প্রভাব :** বাংলাদেশের জনসংখ্যা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থা অর্থাৎ সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথে প্রভাব পড়ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হলেও অতিরিক্ত যানবাহন এবং জনসংখ্যাজনিত কারণে যানবাহনের চাপ এবং দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া রাজধানী ঢাকাসহ বড় বড় শহরগুলোতে অতিরিক্ত গাড়ীর কারণে সব সময় যানজট লেগেই থাকে।

১০. **অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমশক্তির (১৫ বছর+) সংখ্যা প্রায় ৬.১ কোটি (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৭)। বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম এই জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে অনেককে অলস সময় অতিবাহিত করতে হয়। এতে অলস জনগোষ্ঠি অপচিন্তায় জড়িয়ে পড়ে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। ফলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

১২. **বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের নির্ভরতা :** অধিক জনসংখ্যার ফলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের উপর অধিক নির্ভরশীল হতে হয়। এতে দেশের অর্থনীতির ভিত্তির উপর প্রভাব পড়ে যা দেশের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

১৩. **পরিবেশের উপর প্রভাব :** অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে নগরীয় অঞ্চলে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মৃত্তিকা দূষণসহ বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এছাড়া শহরে খোলামেলা জায়গার অভাবে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপর প্রভাব পড়ে।

বর্ণিত আলোচনায় আমরা অধিক জনসংখ্যার ফলে যেসব ক্ষেত্রে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেগুলো সম্পর্কে জানলাম। তবে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে পারলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। পরবর্তী পাঠে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত প্রভাব বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

কোনো দেশ বা অঞ্চলের জন্য জনসংখ্যা যেমন অপরিহার্য, তেমনি অধিক জনসংখ্যার ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে আয়তন এবং সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় প্রায় সর্বক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে কৃষি জমি, চাকুরি ও কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, খাদ্য ও পুষ্টি, বাসস্থান, সুপেয় পানি, শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাত্রার মান, যাতায়াত ব্যবস্থা, সামাজিক স্থিতশীলতা, পরিবেশ প্রভৃতির উপর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এসব

কারণে অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে যে সকল নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোকে ইতিবাচকে রূপান্তরের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মানব সম্পদে পরিণত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

১। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে কততম?
(ক) সপ্তম (খ) অষ্টম (গ) নবম (ঘ) দশম

২। নিচের কোন দেশটি অধিক ঘনবসতিপূর্ণ?
(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (খ) জাপান (গ) যুক্তরাজ্য (ঘ) বাংলাদেশ

৩। ২০১৭ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির সংখ্যা কত?
(ক) ৬.১ কোটি (খ) ৬.২ কোটি (গ) ৬.৩ কোটি (ঘ) ৬.৪ কোটি

জনাব আজমলের ছয় সন্তান। বসতবাড়ি ছাড়া নিজের কোনো জমিজমা নেই। তিনি যে আয় করেন তা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

৪। উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবারের আলোচ্য সমস্যার কারণ কী?
(ক) অধিক সন্তান (খ) পরিকল্পিত পরিবার (গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘ) সম্পত্তির বন্টন

৫। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে প্রভাব পড়ে–
i. কৃষি জমিতে ii. কর্মসংস্থানে iii. বাসস্থানে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৮ বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায় (Way to Make the Population of Bangladesh into Human Resources)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায়

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। আয়তনের তুলনায় এদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ সর্বত্রই প্রতিফলিত হয়। তবে এই জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারলে তা দেশের জন্য কল্যাণকর এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হবে। তাই অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে বোঝা হিসেবে মনে না করে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বিশ্বায়নের এই যুগে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকসমূহ জাতীয় উন্নয়নের একটি অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠি দেশের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব কল্যাণ। মানব উন্নয়ন সূচকসমূহের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা, ভারত এবং ভূটান বাংলাদেশ অপেক্ষা এগিয়ে রয়েছে। তবে নেপাল এবং পাকিস্তান এর অবস্থান বাংলাদেশ অপেক্ষা নিচে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬)।

বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায় : জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য কতকগুলো মৌলিক উপাদান নিশ্চিত করা আবশ্যক। বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায়সমূহ সর্ম্পকে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ : জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে প্রত্যেক মানুষই সুস্থ, সবল ও নিরোগ হয় এবং এতে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির একটি অংশ পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের মানব সম্পদে পরিণত করা দূরূহ ব্যাপার।

২. শিক্ষা : জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে আধুনিক শিক্ষা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখা, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠিকে মানব সম্পদে পরিণত করা যায়। এতে দেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা : কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। অসচ্ছল পরিবারের যুবশক্তিকে আত্মকর্মসংস্থান ও দেশে-বিদেশে চাকুরির বাজার ভিত্তিক উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ট্রেড ও কারিগরি শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এছাড়া শহর এবং গ্রাম পর্যায়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

৪. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার : পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। ইতোমধ্যে সরকার তথ্য প্রযুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলছে। সরকারের এই উদ্যোগ দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির জীবনযাপনের মান সহজ করার পাশাপাশি তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক মানব সম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্য প্রযুক্তির এ ধারার মাধ্যমেও জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যাবে।

৫. নারীর ক্ষমতায়ন : আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেকই নারী। তাই সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ইতোমধ্যে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করা যাবে।

৬. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা : জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুন

নতুন কল-কারখানা স্থাপন ও কুটির শিল্পের বিকাশ এবং বিদ্যমান শিল্পের যথোপযুক্ত উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া হাঁস-মুরগী ও পশুপালন, মাছ চাষ, ফল চাষ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করতে হবে। বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠিকে বিদেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। যা অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. গ্রামীণ উন্নয়ন : বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। এজন্য গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে হবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠিকে বহুমুখী কর্মে সম্পৃক্ত করতে পারলে মানব সম্পদে পরিণত করা সহজ হবে।

৮. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : মানুষের কর্মদক্ষতা তার জীবনযাত্রার মানের উপর নির্ভর করে। নিম্নমানের জীবনযাপনরত শ্রমিকসহ অন্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বেতন ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. উপযুক্ত বাসস্থান ও সুপেয় পানি : উপযুক্ত বাসস্থান মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে এবং সুস্থ ও চিন্তামুক্ত রাখে। যা মানবসম্পদ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে। এছাড়া শরীর সুগঠিত ও সুস্থ এবং রোগ-বালাই মুক্ত রাখতে সুপেয় পানি আবশ্যক। তাই সকলের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানসহ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. সুচিকিৎসার ব্যবস্থা : মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সুস্থ এবং সবল জনগোষ্ঠি প্রয়োজন। এজন্য গ্রাম এবং শহর উভয় স্থানে সকলের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যমান চিকিৎসা সেবাকে উন্নত এবং বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. মাদকমুক্ত সমাজ গঠন : জনগণের কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে কাজ করতে হবে। মাদকের ভয়াল ছোয়া যাতে যুবসমাজকে গ্রাস করতে না পারে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে এবং মাদকের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে জীবন ও জীবিকার তাগিদে কর্মমুখী হওয়ার চেষ্টা করবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন নিশ্চিত হবে।

১২. জনশক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি : দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠিকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য সুপরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, জনগণের পুষ্টিহীনতা দূরীভূতকরণ, শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দক্ষ শ্রমিক তৈরির লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা প্রদান, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

জনবহুল বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে সীমিত সম্পদ দিয়েই সকলের চাহিদা পূরণ করতে হয়। এজন্য বিপুল এই জনগোষ্ঠিকে মানব সম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। জনসংখ্যাকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা না করে মানব সম্পদ হিসেবে গণ্য করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, কর্মমুখী শিক্ষা, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মাদকমুক্ত সমাজগঠন, জনশক্তি উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। এছাড়া বিদেশেও অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার উপায় হলো–

i. শিক্ষা ii. প্রশিক্ষণ iii. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii. (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কোন কাজগুলো উৎসাহিত করা প্রয়োজন?

(ক) পশুপালন (খ) ফল চাষ (গ) মাছ চাষ (ঘ) সবগুলো সঠিক

৩। জনশক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োজন কেন?

(ক) মানবসম্পদের জন্য (খ) বেকার সৃষ্টির জন্য (গ) ব্যক্তিগত স্বার্থে (ঘ) খাদ্য উৎপাদনের জন্য

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

নিচের চিত্রটি দেখুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ক. জনসংখ্যা বলতে কী বুঝায়?

খ. স্থুল জন্ম ও স্থুল মৃত্যুহার নির্ণয়ের সূত্র দুইটি লিখুন।

গ. বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যার ভিন্নতার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যা বন্টনের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

সুজানা উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে গমন করেন। সেখানে উচ্চ শিক্ষা শেষে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে যোগদান করলেন। চাকুরি করে যা আয় করেন তার একটি অংশ দেশে বসবাসরত বৃদ্ধ বাবা-মার জন্য প্রেরণ করেন। এতে বাবা-মা বেশ স্বচ্ছলভাবে দিনযাপন করতে পারছেন। একই সাথে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে অবদান রাখছেন।

ক. বিশ্বে আধুনিক আদমশুমারী চালু হয় কত সালে?

খ. জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামকসমূহ লিখুন?

গ. উদ্দীপকে আলোচ্য গমনের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব তুলে ধরুন।

ঘ. সুজানার বাসস্থান পরিবর্তনের ফলে গন্তব্যস্থলে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন? বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩ : নিচের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

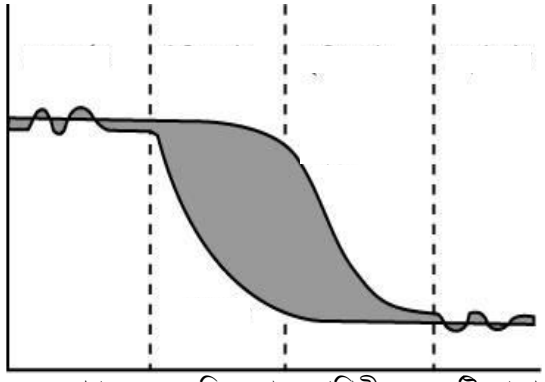

ক. জনসংখ্যা ঘনত্বের দিক থেকে পৃথিবীকে কতটি ভাগে ভাগ করা যায়?

খ. জনসংখ্যা পরিবর্তন বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মডেলটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

ঘ. বাংলাদেশ আলোচ্য মডেলের কোন পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন? আপনার স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.১	:	১. ক	২. গ	৩. গ	৪. খ	৫. ক	৬. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.২	:	১.ক	২.খ	৩. ঘ	৪. গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৩	:	১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৪	:	১. ক	২. ঘ	৩. ক	৪. ক	৫. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৫	:	১. ঘ	২. ক	৩. ঘ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৬	:	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. গ	৫. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৭	:	১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৩.৮	:	১. খ	২. ঘ	৩. ক			

পাঠ-৩.৯ বয়স-লিঙ্গ পিরামিড অঙ্কন ও বিশ্লেষণ (Presentation of Age-Sex Pyramid and Analysis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বয়স-লিঙ্গ পিরামিড বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বয়স-লিঙ্গ পিরামিড অঙ্কন ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বয়স-লিঙ্গ পিরামিড

যে লেখচিত্রের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের বয়স-লিঙ্গ একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়, তাকে বয়স-লিঙ্গ পিরামিড বলে। বয়স-লিঙ্গ পিরামিডের মাধ্যমে বিভিন্ন বয়সের এবং কাঠামোর জনসংখ্যা প্রদর্শন করা যায়। একেকটি বয়স শ্রেণির জন্য নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র আনুভূমিক স্তম্ভ অঙ্কন করা হয়।

বয়স-লিঙ্গ পিরামিড অঙ্কন পদ্ধতি : বয়ম-লিঙ্গ পিরামিডে নারী ও পুরুষ দুইভাগে ভাগ করে দেখানো হয়। পিরামিডের বামপাশে ভূমি অক্ষে পুরুষদের বয়সভিত্তিক আয়তলেখ এবং ডানপাশে নারীদের বয়সভিত্তিক আয়তলেখ দেখাতে হয়। পিরামিডের লম্ব অক্ষে বয়সভিত্তিক বিন্যাস দেখানো হয়। জনসংখ্যার বয়সভেদে ০-৪, ৫-৯, ১০-১৪, ১৫-১৯, ২০-২৪, ২৫-২৯ প্রভৃতি শ্রেণি ব্যবধানে দেখানো হয়। পিরামিডের ভূমি অংশে নারী ও পুরুষ জনসংখ্যার আকার সংখ্যায় বা শতকরা হিসেবে দেখানো হয়।

উদাহরণ : ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী ও পুরুষের বয়স এবং লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা দেওয়া হলো (সারণি ৩.৯.১)। প্রদত্ত উপাত্তের ভিত্তিতে বয়স-লিঙ্গ পিরামিড অঙ্কন করতে হবে।

সারণি ৩.৯.১ : বাংলাদেশের বয়স-লিঙ্গভিত্তিক জনসংখ্যা-২০১১

বয়স শ্রেণি (বছর)	পুরুষ (লক্ষ)	নারী (লক্ষ)	বয়স শ্রেণি (বছর)	পুরুষ (লক্ষ)	নারী (লক্ষ)
০-৪	৭৬.৩৮	৭৪.২৩	৪০-৪৪	৪২.৮০	৩৯.৮০
৫-৯	৯৩.২২	৮৮.৫০	৪৫-৪৯	৩৩.৬৩	৩০.১৬
১০-১৪	৮৬.১৪	৮০.৩১	৫০-৫৪	২৯.৫২	২৫.৯৯
১৫-১৯	৬৫.০৯	৬৩.৫২	৫৫-৫৯	১৯.২৩	১৫.৭৭
২০-২৪	৫৭.৭৭	৭৫.২২	৬০-৬৪	২০.৮১	১৮.৫২
২৫-২৯	৬২.২৫	৭২.৫৪	৬৫-৬৯	১১.৪৯	৯.৬৩
৩০-৩৪	৫০.৭৯	৫৪.২০	৭০-৭৪	১২.০৬	১০.২৫
৩৫-৩৯	৪৬.৯৭	৪৮.৫৯	৭৫+	১২.৮৭	১২.০২

সমাধান : প্রথমে একখণ্ড কাগজ নিই। এখন কাগজের বিস্তার অনুযায়ী পিরামিডের ভূমি অক্ষের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করি। পিরামিডের ভূমি অংশে নারী ও পুরুষ জনসংখ্যার আকার এবং লম্ব অক্ষে বয়সভিত্তিক বিন্যাস দেখাই। জনসংখ্যার আকার লক্ষ হিসেবে এবং শ্রেণি ব্যবধান বয়সভেদে ০-৪, ৫-৯, ১০-১৪, ১৫-১৯, ২০-২৪, ২৫-২৯, ৩০-৩৪, ৩৫-৩৯, ৪০-৪৪, ৪৫-৪৯, ৫০-৫৪, ৫৫-৫৯, ৬০-৬৪, ৬৫-৬৯, ৭০-৭৪, ৭৫+ নিই। জনসংখ্যার আকার অনুযায়ী বিভিন্ন বিন্দুর মাধ্যমে একটি আয়তলেখের উপর অপর একটি আয়তলেখ স্থাপন করে দুটির মাঝখানে ব্যবধান বের করি। এরপর প্রদত্ত উপাত্তগুলোকে পিরামিডের বামপাশে ভূমি অক্ষে পুরুষদের বয়সভিত্তিক আয়তলেখ এবং ডানপাশে নারীদের বয়সভিত্তিক আয়তলেখ দেখাই। আলোচ্য নিয়মে প্রদত্ত উপাত্তের আলোকে বয়স-লিঙ্গ পিরামিড অঙ্কন সম্পন্ন করা হলো (চিত্র ৩.৯.১)।

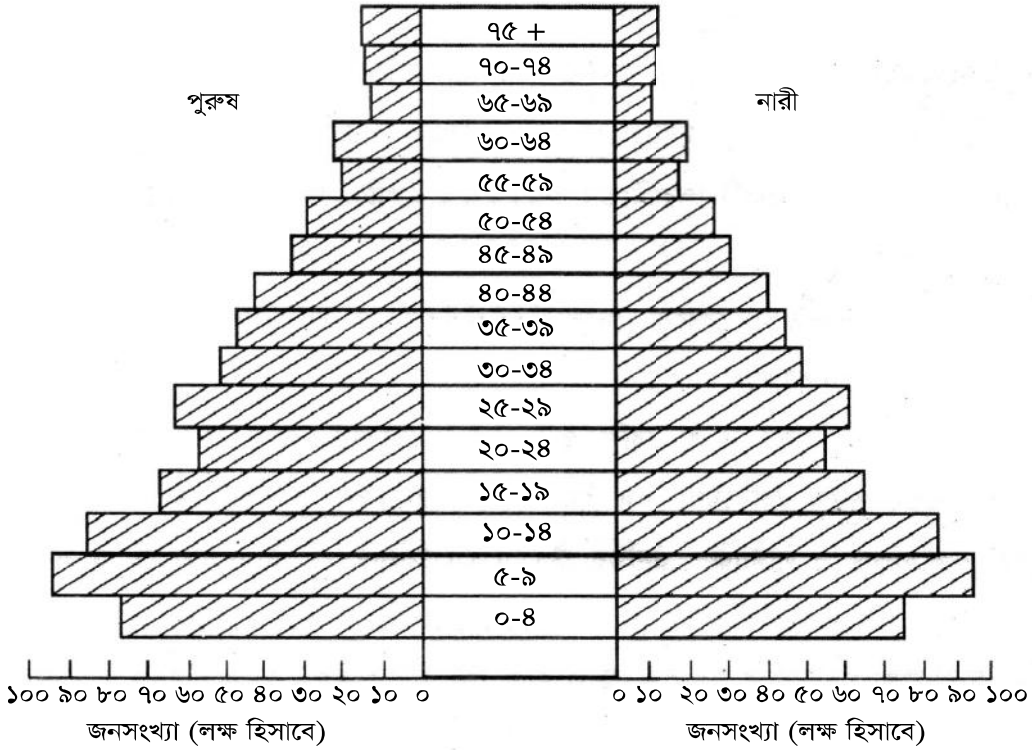

চিত্র ৩.৯.১ : ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বয়স-লিঙ্গ পিরামিড

বিশ্লেষণ : অঙ্কিত বয়স-লিঙ্গ পিরামিডটি পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায়-

১. পিরামিডের নিচের অংশ প্রশস্ত। অর্থাৎ কম বয়সী নারী-পুরুষের সংখ্যা বেশি। ০-১৪ বছর শিশু বা কম বয়সী নারী ও পুরুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫%। এর মধ্যে নারী ১৮% এবং পুরুষ ১৭%।

২. পিরামিডটির মধ্যাংশ থেকে উপরের দিকে ক্রমশ চওড়া কমে গেছে। এ অংশে ১৫-৪৯ বছর বয়সের লোকসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫২%। এর মধ্যে নারী ২৭% এবং পুরুষ ২৫%। এই বয়স সীমায় নারী ও পুরুষ উভয়ের কর্মক্ষমতা সর্বোচ্চ থাকে। ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. পিরামিডের উপরের দিকে ক্রমশ সরু। অর্থাৎ বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ৫০ বছরের উর্দ্ধে জনসংখ্যা প্রায় ১৩%। এর মধ্যে নারী ৬% এবং পুরুষ ৭%।

৪. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে পিরামিডের সবচেয়ে উপরের আয়তলেখটি তার ঠিক নিচের দুটির তুলনায় কিছুটা বড়।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সশ্রেণির নারী ও পুরুষের সংখ্যা নিম্নে দেখানো হলো। বয়স-লিঙ্গ পিরামিড অঙ্কন করে বিশ্লেষণ করুন।

বয়স শ্রেণি (বছর)	পুরুষ (লক্ষ)	নারী (লক্ষ)	বয়স শ্রেণি (বছর)	পুরুষ (লক্ষ)	নারী (লক্ষ)
০-৪	৯৪.৮২	৯২.১৩	৩৫-৩৯	৩৩.৬৭	২৭.৮২
৫-৯	৯৫.০৫	৮৮.৮৬	৪০-৪৪	২৫.১৯	২২.১৫
১০-১৪	৭১.৭৫	৬২.৬৭	৪৫-৪৯	১৯.৫৮	১৬.৬৯
১৫-১৯	৪৮.১৯	৪৬.৮১	৫০-৫৪	১৬.৮৭	১৫.৩৭
২০-২৪	৪৩.৫৬	৫০.০৯	৫৫-৫৯	১১.১৭	৮.৯৮
২৫-২৯	৪৫.৩৭	৪৯.৩৪	৬০-৬৪	১২.৫১	১১.২৮
৩০-৩৪	৩৪.৯৫	৩৩.০২	৬৫+	২০.৪৭	১৬.২০

পাঠ-৩.১০ মানচিত্রে জনসংখ্যার বণ্টন প্রদর্শন (Presentation of Population Distribution in Map)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের মানচিত্রে বিভাগভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব দেখাতে পারবেন।

মানচিত্রে জনসংখ্যার বণ্টন প্রদর্শন

কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যার বণ্টন মানচিত্রে প্রদর্শন করা যায়। এক্ষেত্রে উক্ত দেশ বা অঞ্চলের মানচিত্র এবং উপাত্ত প্রয়োজন হয়। জনসংখ্যা বণ্টনের উপাত্ত যে কোনো এককে দেখানো হয়। যেমন-ঘনত্ব, মোট জনসংখ্যা ইত্যাদি। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪.৪১ কোটি এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে ঘনত্ব ১০১৫ জন। কিন্তু জনসংখ্যার এই ঘনত্ব দেশের সর্বত্র সমান নয়। স্থানভেদে জনসংখ্যার ঘনত্বে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- উপজেলা, জেলা, বিভাগভেদে জনসংখ্যার পার্থক্য আছে। ব্যবহারিকের এই পাঠে বাংলাদেশের বিভাগীয় জনসংখ্যার ঘনত্বের পার্থক্য মানচিত্রে দেখানো হলো (সারণি ৩.১০.১)।

সারণি ৩.১০.১ : বিভাগ অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব-২০১১

বিভাগ	জনসংখ্যার ঘনত্ব (বর্গকিলোমিটারে)
ঢাকা	১,৭৭৬
রাজশাহী	১,০১৫
চট্টগ্রাম	৮৩৮
খুলনা	৭০৪
সিলেট	৭৮৪
বরিশাল	৬৩০
রংপুর	৯৬০
ময়মনসিংহ	১,০৩০

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০১৫

অঙ্কন পদ্ধতি : সারণি ৩.১০.১ এ প্রদত্ত জনসংখ্যার ঘনত্বকে ৫০০-১০০০, ১০০১-১৫০০ এবং ১৫০০ এর অধিক এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করি। উক্ত শ্রেণি ব্যবধানের অন্তর্গত বিভাগসমূহকে একই ধরনের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে মানচিত্রটি অঙ্কন সম্পন্ন করি।

বিশ্লেষণ : চিত্র ৩.১০.১ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগসমূহের মধ্যে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং রংপুরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৫০০-১০০০ জন। রাজশাহী এবং ময়মনসিংহ বিভাগে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০০ থেকে ১৫০০ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যার সর্বাধিক ঘনত্ব ঢাকা বিভাগে। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১৫০০ জনের অধিক। সারণি ৩.১০.১ অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে ময়মনসিংহ দ্বিতীয়, রাজশাহী তৃতীয়, রংপুর চতুর্থ, চট্টগ্রাম পঞ্চম, সিলেট ষষ্ঠ, খুলনা সপ্তম এবং বরিশাল বিভাগ অষ্টম অবস্থানে।

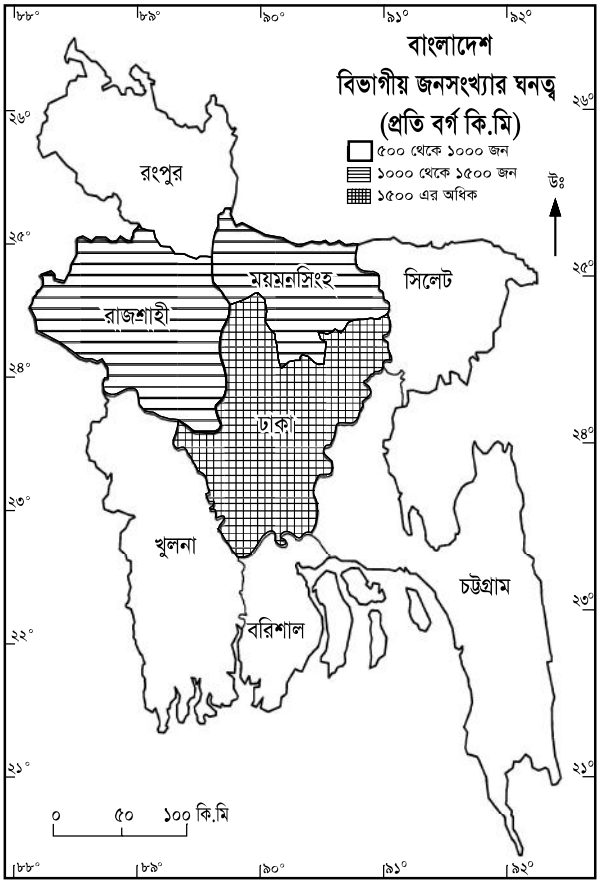

চিত্র ৩.১০.১ : বাংলাদেশের মানচিত্রে বিভাগ অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব